একরাত্তি মাটি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

একরত্তি মাটি

প্রাতরাশের পর মানিক উচ্চস্বরে খবরের কাগজ পাঠ করতে লাগল এবং জয়ন্ত একমনে শুনতে লাগল খবরগুলো।

ভৃত্য মধুর প্রবেশ সঙ্গে তার এক পাহারাওয়ালা।

জয়ন্ত শুধোলে, ব্যাপার কী?

পাহারাওয়ালার মুখে শোনা গেল, ইনস্পেকটর সুন্দরবাবু এই পাড়ায় তদন্তে এসেছেন, জয়ন্তের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতে চান।

জয়ন্ত বলল, চলো মানিক, নিশ্চয় কোনও নতুন মামলা! একঘেয়ে কাগজ শোনার চেয়ে নতুন মামলা নিয়ে নাড়াচাড়া করা ভালো।

মানিক বললে, হ্যাঁ, তাতে আমাদের সময়ও কাটে, আর সুন্দরবাবুরও হাতযশ বাড়ে।

.

গঙ্গার ধার। রেল লাইনের সামনেই একখানা মাঝারি আকারের তিনতলা বাড়ি। সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এই পাহারাওয়ালা।

বৈঠকখানায় কয়েকজন লোকের সঙ্গে বসে আছেন সুন্দরবাবু। একগাল হেসে বললেন, এসো জয়ন্ত, এসো মানিক।

জয়ন্ত বলল, আবার কোনও নতুন মামলার হামলা সামলাতে এসেছেন বুঝি?

হুম, তা ছাড়া আর কি? সেই জন্যেই তো আজকে তোমাদের চায়ের আসরে যাওয়া হল না।

মানিক বলল, না গিয়ে ভালো করেননি। মধু আজ একটি চমৎকার খাবার বানিয়েছিল।

কী খাবার?

চকোলেট স্যান্ডউইচ।

সুন্দরবাবু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন বিরসবদনে।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, মামলাটা কীসের?

কাল এই বাড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে হয়েছে হত্যার চেষ্টা।

–তাহলে সামান্য মামলা নয় দেখছি। গোড়া থেকে সব খুলে বলুন।

সুন্দরবাবু যা বললেন, মোটামুটি তা হচ্ছে এই–

অনন্তচন্দ্র পাইন হচ্ছেন বিখ্যাত লৌহ ব্যবসায়ী। তার দোকান কলকাতার লোহাপট্টিতে এবং তার বসতবাড়ি গঙ্গার ধারে। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান।

তাঁর পিতার দুই বিবাহ। তিনি প্রথম পক্ষের পুত্র। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রের নাম নবীনমাধব, বয়স ছাব্বিশ বৎসর। তার পিতা পরলোকে। তার বিমাতা ইহলোকেই বিদ্যমান বটে, কিন্তু বাস করেন পিত্রালয়ে, কারণ অনন্তবাবুর সঙ্গে তার বনিবনা নেই। তবে সপত্নী-পুত্র তাকে মাসোহারা থেকে বঞ্চিত করেননি।

অনন্তবাবুর সম্পত্তি সোপার্জিত এবং তার অবর্তমানে সেই সম্পত্তির অধিকারী হবে নবীনমাধবই। বিমাতার সঙ্গে না বলেও অনন্তবাবু তার বৈমাত্রেয় ভাইটিকে ভালোবাসেন যার পর নাই এবং এনে রেখেছেন নিজের কাছেই।

অনন্তবাবুর ম্যানেজারের নাম সুবোধকুমার বসু, লোহার কারবারে তিনিই তার দক্ষিণ হস্তের মতো। দশ বছরের বিশ্বাসী লোক, প্রভুর অনেক টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।

ঘটনার দিন কার্যসূত্রে অনন্তবাবুকে যেতে হয়েছিল আসানসোলে। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে দোকান বন্ধ করে সুবোধ পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে অনন্তবাবুর বাড়িতে আসে এবং দোতলার ঘরে লোহার সিন্দুকে টাকাগুলি রাখে। তারপর ঘরের দরজায় তালা দিয়ে সিন্দুকের ও দরজায় চাবি নবীনমাধবের হাতে অর্পণ করে নিজের বাসায় চলে যায়। সে বাস করে গঙ্গার অপর পারে ঘুষুড়িতে।

নবীন সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে ভোরবেলায়। রাত্রিবেলায় বাড়িতে ছিল একজন দারোয়ান, একজন ভৃত্য। আরও একজন দারোয়ান ও একজন ভৃত্য অনন্তবাবুর সঙ্গেই আসানসোলে গিয়েছিল। পাঁচক ও দাসী ঠিকা, তারা রাত্রে বাড়িতে থাকে না।

সকালে নবীন বাড়ি ফিরে আসবার আগেই ভৃত্য রঘুর নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে বাইরে এসে দেখে, উঠোনের ওপরে পড়ে আছে দারোয়ানের অচৈতন্য দেহ, তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন, মাটির ওপরে রক্তের ধারা। আর একগাছা রুপো-বাঁধানো, মোটা রক্তাক্ত লাঠি!

তার চিৎকারে যখন লোকজন জড়ো হয়েছে, সেই সময়েই নবীন বাড়িতে ফিরে আসে। তারপর দেখা যায়, দোতলায় অনন্তবাবুর ঘরের দরজা খোলা, লোহার সিন্দুকেরও দরজা খোলা, পঁচিশ হাজার টাকা অদৃশ্য। নবীন তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশ-তদন্তে এই তথ্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে।

দরজায় ও লোহার সিন্দুকের চাবি কাল থেকে আজ পর্যন্ত নবীন একবারও কাছছাড়া করেনি। অথচ দরজায় তালা ও সিন্দুকটা যে চাবি দিয়েই খোলা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।

রাত্রে সে কোথায় ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে নবীন বলে, এক বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে বন্ধুর নাম ও ঠিকানা আদায় করা যায়নি।

দারোয়ানের দেহের পাশে যে মোটা লাঠিগাছা পাওয়া গিয়েছে, তার অধিকারী যে স্বয়ং নবীন সেটাও প্রমাণিত হয়েছে।

ভৃত্য রঘু বলে, রাত্রে সে কোনও শব্দ শোনেনি। দারোয়ান তাকে সিদ্ধি খাইয়ে দিয়েছিল। সিদ্ধি খেতে সে অভ্যস্ত নয়, ঘুমিয়ে একেবারে বেহুশ হয়ে পড়েছিল।

অপরাধী যে কেমন করে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল, এ সমস্যার কোনওই সমাধান হয়নি। সদর দরজা রঘু নিজের হাতে বন্ধ করেছিল। বাইরে থেকে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করবার দ্বিতীয় কোনও উপায়ই নেই।

দারোয়ানই কি কড়া নাড়া শুনে অপরাধীকে দরজা খুলে দিয়ে পরে তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে? এ প্রশ্নেরও জবাব পাবার উপায় নেই। কারণ দারোয়ান এখনও অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে।

সমস্ত শুনে জয়ন্ত মুখে কিছু বলল না। বাড়ির বাইরে গিয়ে খানিকক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে, আবার ফিরে এসে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, সুন্দরবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন। বাইরে থেকে এ বাড়ির ভিতরে আসবার কোনও উপায় নেই।

–তাহলে অপরাধী বাড়ির ভেতরে এল কেমন করে?

–এই সদর দরজা দিয়ে।

দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

জয়ন্ত জবাব দিল না। নিচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে উবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর মাটির ওপর থেকে কী একটা তুলে নিয়ে চোখের কাছে এনে পরীক্ষা করল। তারপর পকেটের ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে জিনিসটা মুড়ে রাখল।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, কী ওটা?

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একরত্তি মাটি। সে নতমুখে এদিকে-ওদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে অগ্রসর হল। উঠোনের ওপরে আবার বসে পড়ল। আবার কী তুলে নিয়ে মোড়কের ভিতরে রেখে উঠে দাঁড়াল।

সুন্দরবাবু বললেন, আবার কী পেলে হে!

আবার একরত্তি মাটি।

–খালি খালি মাটি কুড়িয়ে ছেলেখেলা করছ কেন? কাজের কথা বলো।

–দোতলায় চলুন। যে ঘর থেকে টাকা চুরি গিয়েছে সেইখানে।

কিন্তু সেখানে নতুন কিছুই আবিষ্কৃত হল না।

জয়ন্ত বলল, এ মামলায় একটা মস্ত সূত্র হচ্ছে নবীনের রক্তাক্ত লাঠিগাছা।

–হুম, আরও দুটো বড় সূত্র আছে। প্রথম, নবীনের কাছে ছিল দরজার আর সিন্দুকের চাবি। দ্বিতীয়, কাল কোথায় রাত্রিবাস করেছিল, সে কথা বলতে নারাজ কেন?

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, উঁহু, ওর চেয়ে বড় সূত্র হচ্ছে ওই লাঠিগাছা।

হ্যাঁ, ওই সূত্র ধরে আমি নবীনকে গ্রেফতার করতে পারি।

আপাতত সে চেষ্টা করবেন না।

–যদি সে পালায়?

–আমি নবীনের মুখ দেখেছি। বুদ্ধিমানের মুখ। বোকার মতন এখন পালিয়ে গিয়ে সে নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে না।

–ওই নবীন আর সুবোধ এইদিকে আসছে। ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করবে কি?

নবীন ও তার পিছনে-পিছনে সুবোধ এসে দাঁড়াল জয়ন্তর সামনে। নবীনের মুখশ্রী, দেহের গঠন ও গায়ের রং চমৎকার। চোখের চাহনি শিশুদের মতন সরল। কিন্তু কারুর মুখ। দেখে পুলিশ ভোলে না। কারণ, এমন অপরাধীর সংখ্যাও অল্প নয়, যাদের মতো দেববাঞ্ছিত চেহারা পেলে মুনি-ঋষিরাও নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন।

সুবোধের চেহারাও নিরীহ গোছের, শ্যামবর্ণ, দোহারা দেহ, মাথায় মাঝারি, মুখ হাসি। হাসি। চেহারায় কোনও বৈশিষ্ট্য না থাকলেও মানুষটিকে মন্দ বলে মনে হয় না।

জয়ন্ত বলল, আসুন নবীনবাবু। বলতে পারেন দারোয়ানের দেহের পাশে আপনার লাঠিগাছা পাওয়া গেছে কেন?

শুষ্ককণ্ঠে নবীন বলল, কেমন করে বলব মশাই; আমার নিজের মনেও বার বার জাগছে। ওই প্রশ্নই। আমি হতভম্ব হয়ে গেছি।

সুবোধের দিকে ফিরে জয়ন্ত বলল, শুনলুম আপনার বাড়ি ঘুষুড়িতে। আপনি রোজ সেখান থেকে আনাগোনা করেন, না কলকাতাতেও কোনও বাসা রেখেছেন?

সুবোধ বলল, গঙ্গার এপারে কলকাতা, ওপারে ঘুষুড়ি। দূর তো বেশি নয়, তাই ঘুষুড়ি থেকেই আনাগোনা করি।

–অনন্তবাবু আপনাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন?

সুবোধ ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, কিন্তু কালকের ঘটনার পরও তিনি কি আর আমাকে। বিশ্বাস করবেন?

নবীন বলল, আমিও কেমন করে দাদার কাছে মুখ দেখাব জানি না।

জয়ন্ত বলল, আপনাদের বেয়ারা রঘুকে একবার আসতে বলুন।

রঘু এলে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের সদর দরজা থেকে উঠোন পর্যন্ত রোজ ধোয়া-মোছা, আঁট দেওয়া হয়?

রঘু হাত জোড় করে বলল, হ্যাঁ হুজুর, দুবেলাই। কর্তাবাবু কোথাও এক তিল ধুলো দেখলে রেগে আগুন হয়ে ওঠেন।

সদরের জানলা দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বলল, এত কাছে গঙ্গা, তোমরা নিশ্চয়ই রোজ গঙ্গাস্নান করো?

না হুজুর, গঙ্গায় স্নান করতে যাই কালে-ভদ্রে।

কাল সকালে কি বৈকালে তোমাদের কেউ গঙ্গাস্নান করতে যায়নি?

–না, হুজুর।

সুন্দরবাবু, আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই। এসো মানিক।

জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুও নীচে নেমে শুধোলেন, কী হে ভায়া, উঠোন ঝট দেওয়া, গঙ্গাস্নান করার সঙ্গে টাকা চুরির সম্পর্কটা কোনখানে?

–এখন বুঝবেন না।

–নতুন কোনও সূত্র পেয়েছ বুঝি?

–পেয়েছি। সবচেয়ে বড় সূত্র।

সূত্রটা কী?

–একরত্তি মাটি।

জয়ন্তর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সুন্দরবাবু বললেন, হুম, তুমি একটি আস্ত বাতুল।

পথ দিয়ে যেতে-যেতে মানিক বলল, আমিও একরত্তি মাটির মানে বুঝলাম না। তুমি এখন কী করবে?

তথ্যানুসন্ধান। আমার বিশ্বাস এটা জটিল মামলা নয়। চোর ধরা পড়তে বেশি বিলম্ব হবে না।

কারুকে তুমি সন্দেহ করেছ?

কারুকে না, কারুকে না। অর্থাৎ সকলকেই। নবীন, সুবোধ থেকে শুরু করে এ বাড়ির পাঁচক, দারোয়ান, বেয়ারা, দাসী, সকলকেই। অথচ চোর হচ্ছে কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি, কিন্তু তা হলেও বাড়ির কেউ না কেউ যে তাকে কোনও সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। আর কোন দিক থেকে সে এসেছে, তা-ও আমি বুঝতে পেরেছি।

কী দেখে বুঝলে?

–একরত্তি মাটি।

জয়ন্ত, তোমার নাগাল পাওয়া ভার।

.

এক, দুই, তিনদিন কেটে গেল। জয়ন্ত মাঝে-মাঝে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

চতুর্থ দিনের প্রভাতী চায়ের আসরে সুন্দরবাবু যথারীতি উপস্থিত।

টেলিফোনের ঘণ্টি বেজে উঠল। রিসিভার ধরে জয়ন্ত বলল, হ্যালো! হ্যাঁ, আমি জয়ন্ত। নমস্কার। কী বললেন? যাকে খোঁজা হচ্ছে, তাকে পেয়েছেন? অতিশয় সুসংবাদ। তার নাম কী? রামলাল? বেশ, বেশ তাকে আজ দুপুরেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, কীসের সুসংবাদ জয়ন্ত?

জয়ন্ত বলল, সুন্দরবাবু, আজ বৈকালে অনন্তবাবুর বাড়ির সকলেই যেন এক জায়গায় হাজির থাকে, এমনকী পাঁচক পর্যন্ত।

কৌতূহল-প্রদীপ্ত মুখে সুন্দরবাবু বললেন, কেন জয়ন্ত, কেন?

সকলের সঙ্গে আমি রামলাল নামে এক ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

–কে রামলাল?

ব্যস, এখন আর কোনও প্রশ্ন নয়। এই বলে জয়ন্ত একেবারে বোবা হয়ে গেল।

.

বৈকাল। অনন্তবাবুর বাড়ির সবাই বৈঠকখানায় হাজির। টেবিলের সামনের চেয়ারখানা দখল করেছেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব। তাদের পিছনে আর একজন লোক। তার খালি পা, কোমর-বাঁধা কাপড়, গায়ে গেঞ্জি, জাতে সে বোধহয় বিহারি!

জয়ন্ত বলল, সুন্দরবাবু, এই লোকটির নাম রামলাল?

–হুম!

–নবীনবাবু, ঘটনার দিন আপনি কোথায় রাত্রিবাস করেছেন বলবেন না?

নবীন কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমাকে মাপ করুন।

–বেশ, আপনাকে তা আর বলতে হবে না, কারণ আমি আপনার গুপ্তকথা জানতে পেরেছি।

নবীনের মুখ হয়ে উঠল উদ্বিগ্ন।

জয়ন্ত বলল, রামলাল, সে রাত্রে এই নবীনবাবু কি তোমার নৌকো ভাড়া করেছিলেন?

রামলাল বলল, না হুজুর!

–তবে?

রামলাল অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে দিল সুবোধকে।

জয়ন্ত বলল, সুবোধবাবু, ঘটনার দিন রাত্রে আপনি রামলালের নৌকো ভাড়া করে কলকাতায় এসেছিলেন কেন?

সুবোধের চেহারা তখন আর নিরীহের মতো দেখাচ্ছিল না। সে গর্জন করে বলে উঠল, মিথ্যে কথা!

–কিন্তু রামলাল আপনাকে শনাক্ত করছে।

–ও ভুল দেখেছে।

–বেশ, আদালতে গিয়ে এই কথাই বলবেন। সকলে এখন আমার কথা শুনুন। জয়ন্ত বলতে লাগল ।

সুন্দরবাবু, আগেই আপনাকে বলেছিলুম, এ মামলার একটা মস্ত সূত্র হচ্ছে, নবীনবাবুর রক্তাক্ত লাঠিগাছা।

নবীনবাবু যদি লাঠি দিয়ে দারোয়ানকে আঘাত করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই নিজের বিরুদ্ধে অতবড় প্রমাণটা নির্বোধের মতো ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে যেতেন না।

এখানেই বোঝা যায় তাঁর বিরুদ্ধে হয়েছিল একটা নিষ্ঠুর চক্রান্ত।

নবীনবাবুর দিকে পুলিশের সন্দেহ আকৃষ্ট করে অপরাধী নিরাপদে বাস করতে চেয়েছে যবনিকার অন্তরালে। নবীনবাবুর রক্তাক্ত লাঠি পাওয়া গেছে ঘটনাস্থলে। ঘরের দরজার চাবিও ছিল তার কাছে। পুলিশ সহজেই ভ্রমে পড়তে পারত।

তার ওপর নবীনবাবু নিজেই ব্যাপারটাকে আরও ঘোরালো করে তুলেছিলেন। তিনি কিছুতেই বলতে রাজি নন, ঘটনার দিন রাত্রে তিনি ছিলেন কোথায়? সে গুপ্তকথা আমি জানতে পেরেছি তার মায়ের কাছে সন্ধান নিয়ে। তিনি ছিলেন তার মায়ের কাছে। অনন্তবাবু তার বিমাতাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। তার সঙ্গে মেলামেশা করলে নবীনবাবু সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন, এই ছিল অনন্তবাবুর কঠিন নির্দেশ। নবীন রক্তের টানে দাদার অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভয়ে সেকথা স্বীকার করতে পারছিলেন না।

নবীনবাবুর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে আমি আর একটা সূত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। ঘটনাস্থলে বাড়ির সদর দরজার কাছে আর উঠানের ওপরে পেয়েছিলুম দু-টুকরো মাটি। পরীক্ষা করে বুঝতে পারলুম, তা গঙ্গামাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। রঘু বেচারা বলল, ঘটনার দিন বাড়ির কেউ গঙ্গাস্নানে যায়নি। সে দু-বেলা বাড়ির উঠোন প্রভৃতি ঝাট দিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে রাখে, তবু ওখানে দু-টুকরো গঙ্গামাটি এল কেমন করে? তুচ্ছ মাটির টুকরো, কিন্তু সূত্র হিসাবে অসামান্য হয়ে উঠল।

করলুম কল্পনাশক্তি প্রয়োগ। মন বলল, অপরাধী এসেছে রাত্রে নৌকোয় চড়ে জলপথে। নদীতে তখন ভাটা ছিল, তাকে নামতে হল ভিজে মাটির উপরে। তার জুতোর তলায় লেগে গেল এঁটেল মাটি। সেই মাটির কিছু অংশ ঝরে পড়েছে ঘটনাস্থলে।

গঙ্গার অপর পারে ঘুষুড়িতে বাস করে সুবোধ। সে কেমন লোক? ঘুষুড়ির পুলিশ সন্ধান নিয়ে সে খবর আমাকে জানিয়েছে। সুবোধ হচ্ছে বিষম জুয়াড়ি। ঋণে সে ডুবে আছে। তার নৈতিক চরিত্রও ভালো নয়। হাতে পঁচিশ হাজার টাকা-অনন্তবাবু অনুপস্থিত, এ সুযোগ হয়তো সে ছাড়তে পারেনি। তার পক্ষে সিন্দুকের তালার দ্বিতীয় চাবি তৈরি করে নেওয়াও কিছুমাত্র কঠিন নয়। সে যদি নৌকো ভাড়া করে ঘুষুড়ি থেকে এসে থাকে, তবে নৌকোয় মাঝিরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে সেইখানেই। তাই পাওয়া গেল। ঘুষুড়ির পুলিশই খুঁজে বার করেছে মাঝি রামলালকে।

কিন্তু সুবোধ বাড়ির ভেতরে ঢুকল কেমন করে? আমার অনুমান রঘু বেয়ারাও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে। সেই সুবোধকে সদর-দরজা খুল দিয়েছে। সে কাজ সেরে যখন সরে পড়ছে, সেই সময়েই দারোয়ানের ঘুম ভেঙে যায়। তার পরের কথা আপনারাই অনুমান করুন।

–সুন্দরবাবু, একরত্তি মাটি কি বড় ফ্যালনা?

সুন্দরবাবু বললেন, উহুম, উহুম!